BENGALI HONOURS

প্রশ্ন ঃ চর্যাপদ কে কোথা থেকে আবিষ্কার করেন? এটি কী নামে কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? চর্যাপদের নামকরণ বিষয়ে আলোচনা করো। ৫/১০

উঃ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নির্দশন চর্যাপদ, এর আবিষ্কার বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা। মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালার অনুসন্ধান করে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার চেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদটি সংগ্রহ করেন। আর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে চর্যার পুঁথি, দোহাকোষ ও ডাকানর্বের পুথি একত্রিত করে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'–নামক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। প্রকাশের পরবর্তীকালে পুথির নামকরণ, নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

নামকরণ বিতর্ক ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথিটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পুষ্পিকা অংশটি পাওয়া যায়নি। ফলে পূর্ণ কোন নামোল্লেখ থাকলেও তার পরিচয় পাওয়া যায় না। শাস্ত্রীমহাশয় নেপালের রাজদরবারে পুঁথির নাম দেখে 'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে প্রকাশ করেন (১৯১৬)।

পরবর্তীকালে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তিনি এই অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠ করে নামকরণ করেন 'চর্য্যাশচর্য্যাবিনিশ্চয়'। যদিও ১৯৩৮সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুঁথিটিকে ডঃ বাগচী 'নবচর্যাপদ' বলে উল্লেখ করেন। ১৯৫৬ সালে শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রীর যুগ্মসম্পাদনায় পুঁথি সম্পাদনা করেন 'চর্যাগীতিকোষ' নামে। কারণ তিনি দেখলেন যে P.Cordier সাহেবের 'তেঙ্গুর গন্থালীর' তালিকায় মুনিদত্তের গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। 'বৃত্তি' অর্থে টীকা, তাই মূল পুথির আসল নাম হিসাবে 'চর্যাগীতিকোষকেই' গ্রহণ করা যায়। আর নেপালের জাতীয় অভিলেখালয়ে রক্ষিত পুঁথিটিকে আধুনিক সংযোজন বলা হলেও তাতে অর্বাচীন নাগরীতে 'চর্যাচর্যটীকা' নামটি লেখা আছে।

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মুনিদত্তের শ্লোকের প্রারম্ভে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচর্য' শব্দের ওপর জোর দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যায় এইসব নামকরণ বিচার করে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের আচরণ বিধি হিসেবে 'চর্যা' নামটিই গ্রহণীয়। আর চর্যার গীতিসংগ্রহ হিসাবে 'চর্যাগীতি' নামটিই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত ও সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ চর্যাপদের রচনাকাল ও কবি পরিচয় নিয়ে যে বিতর্ক আছে, সেদিকে আলোকপাত করো। ১০

উঃ **ভূমিকা ঃ** বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নির্দশন হল চর্যাপদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই চর্যাপদ আবিষ্কার করলেও এর রচনাকাল সম্পর্কে সম্যক কোন তথ্য দিতে পারেন না। বিভিন্ন পন্ডিতেরা চর্যাপদ সম্পর্কে বিভিন্ন রচনাকালের কথা বলেন। সে বিষয়ে নির্দিষ্ট আলোচনার প্রয়োজন।

রচনাকাল ঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে চর্যাগীতির সময়কালের কথা বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, চর্যাগীতির পুঁথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির অপেক্ষায় অর্বাচীন। এই সিদ্ধান্ত থেকে চর্যাগীতির রচনাকাল যে পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী তা বলা যায়।

চর্যার গানগুলি 'গেয়ো'। কবি লোচনদাসের 'সঙ্গীত রত্নাকর' ও সাঙ্গদেবের 'মানসোল্লাস'-এ ১০-১২টি চর্যার লাইন পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকে এই গ্রন্থটি রচিত হলে চর্যার রচনাকাল হিসাবে ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী সময়কে বেছে নেওয়া হয়।

আবার স্বয়ং হরপ্রসাদশাস্ত্রী চর্যার রচনাকাল হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দীর কথা বলেছেন। দ্বাদশ শতকে রচিত জয়দেবের সময়কালে 'সংস্কৃত কোষগ্রন্থে' গানের আলোচনা প্রসঙ্গে 'চর্যা'র আলোচনা আছে। তাই বলা যায় চর্যাগীতির রচনাকাল দ্বাদশ শতকের পূর্বে।

আবার চর্যাগীতি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ভাষাবিজ্ঞানী মহম্মদ শাহীদুল্লাহ এর রচনাকাল হিসাবে অষ্টম শতকের কথাও স্বীকার করেছেন।

অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী চর্যার ভাষা, বৌদ্ধদর্শন ও সমাজচিত্র বিচার করে চর্যাগীতির রচনাকাল হিসাবে

Pearl coaching center

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর উল্লেখ করেছেন। তবে সর্বশেষ ও গ্রহণযোগ্য মতামত হিসাবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'O.D.B.L' গ্রন্থেও চর্যার ভাষা ও কবিদের সময়কাল বিচার করে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের রচনা হিসাবে চর্যাগীতির কথা বলেছেন। আর আচার্য ডঃ সুকুমার সেনও সুনীতিকুমারের শতকে সমর্থন জানিয়ে চর্যার রচনাকাল হিসাবে দশম-দ্বাদশ শতককেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন। সে দিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় চর্যাপদের রচনাকাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। তার আগে বা পরে নয়।

কবিবিতর্ক ঃ চর্যার প্রায় ৪৬টি সম্পূর্ণ ও ১টি অসম্পূর্ণ গান থেকে মোট ২৩ জন কবির নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কবিদের নামোল্লেখ এর ব্যাপারে টীকাকাররা কিছু ভুল করেছেন। আবার গানের ভনিতাংশ 'পা' পদ্যাংশ নিয়ে শিষ্য বা প্রশিষ্য নিয়ে বিতর্ক আছে। যেসমস্ত কবিদের নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল-

কাহ্নপা ঃ চর্যাপদের অন্যতম কবি কাহ্ন পদের পদসংখ্যা ১৩টি। সুকুমার সেন দুইজন কাহ্নের অনুমান করেন। কারণ তাঁর মতে, ১৩টি গানের প্রথম ৬টি চর্যাগান ও পরবর্তী ৭টি গানের ভাষা, বিষয়বস্তু, কাব্যবৈশিষ্ট্যের ভিন্নতাই দুজন কাহ্নের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন। তবে এ বিষয়ে বিতর্ক বর্তমান।

ভুসুক পা ঃ 'ভুসুক' নামটি ছদ্মনাম। তিনি গানেতে নিজেকে 'রাউত' বলে উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ রাজার পুত্র। এই নামকরণ নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে আরও তথ্যের প্রয়োজন।

কুক্কুরী পা ঃ 'পা' শব্দ থেকে অনুমিত হয় চর্যার গানগুলি কুক্কুরী পাদের শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচনা। সুকুমার সেনের মতে কুক্কুরী পা-এর অন্তত দুটি গানে নারী উক্তি পাওয়া যায় বলে কবিকে 'নারী' বলে মনে করা হয়। তবে এবিষয়ে কোন প্রমাণ নেই।

ঢেন্ডন/টেন্টন পা ঃ তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে 'ঢেন্ডন' কে 'বৈতন' বলে মনে করে কাহ্নের বংশধর বলে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ঢেন্ডন অর্থে ঢেঁড়ি বা ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষাকারীকে বোঝায়। তবে অনেক জায়গায় 'টেন্টন' নামটিও ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ ধূর্ত। তাঁর পদে সুলভ চাতুর্যের পরিচয় থাকায় নামের সাথে সঙ্গতি রেখে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। (৩৩)

এছাড়া লুইপা, শবর পা, সরহ পা, চাটিল পা, বজ্র পা, তান্তি পা, বিরুপা প্রভৃতি কবির নাম পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সমকালীন সমাজের যে ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে, তার আলোচনা করো। ১০

উঃ সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ, তাই বলে সমাজের হুবহু বিবৃতি, একজন সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সমাজের খন্ডচিত্র প্রকাশ পাওয়াটাই স্বাভাবিক, এর ব্যতিক্রম ঘটেনি বড়ু চন্ডীদাস-এর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। পঞ্চদশ শতকে রচিত এই কাব্যে সমকালীন সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে।

রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাহিনী নিয়ে 'রচিত' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কাব্যটি। এতে পুরাণের অনুসরণ না থাকলেও পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে চন্ডীদাস তাঁর আপন ভাবরসে জারিত করেছেন। ফলে কৃষ্ণের দৈব্যসাহিত্যের পরিবর্তে লৌকিক কাহিনী বেশি প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য সমালোচক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানকে 'জাগের গান' বা 'জাগ্রত রাখার গান' কখনো বা 'ধামালীগানে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।তাসত্ত্বেও বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত আদিরসাত্মক এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পঞ্চাদশ শতকীয় বঙ্গসমাজের বাস্তবচিত্রের ছবি পাওয়া যায়। সেই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে।

সামাজিক প্রথা ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গৌরদান বা গৌরীবিবাহ বা বাল্যবিবাহের কথা আছে। যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেযুগের বঙ্গসমাজে বাল্যবিবাহ প্রথাটির প্রচলন ছিল। তাই আইহন পত্নী রাধাও বাল্য বিবাহিতা এগারো বছরের পূর্বেই তার বিবাহের কথা পাওয়া যায়।

যৌথ পরিবার ঃ যৌথ পরিবারিক পরিকাঠামো, যা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, তার ছবিও এই কাব্যে বর্তমান। তাই বধূ রাধা তাঁর স্বামী আইহন, ননদ, শাশুড়িকে নিয়ে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। আবার যখন রাধার 'দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা' তখন রক্ষণাবেক্ষণার্থে বড়াইকে নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে কবি বড়ু চন্ডীদাস সমকালীন পারিবারিক জীবনকে কাব্যে রূপায়িত করেছেন।

BENGALI HONOURS

গ্রামজীবন ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' গ্রামবাংলার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা আসলে মথুরা-বৃন্দাবনেরই প্রতিচ্ছবি। পুরুষতান্ত্রিক বাংলাসমাজে স্ত্রীরাও জীবিকা সংস্থানে যুক্ত ছিল। তাই, রাধিকাও স্বামীকে ব্যবসায় সাহায্য করার জন্য মথুরায় দধি দুগ্ধ বিক্রয় করতে যেত। এইভাবে সমকালীন গ্রামীণ সমাজে নারীর অবস্থান ধরা পড়ে।

জীবিকা ঃ এই কাব্যে তৎকালীন বঙ্গসমাজের নানা জাতিগত বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, তেলি, কুমোর, ক্ষত্রিয়, তাঁতি, নাপিত, মাঝির মত নানান শ্রেণির মানুষের কথা পাওয়া যায়। যেমন -কান্ধে কুরু আ লআঁ তেলি আগে জাত্র...(বংশীখন্ড)
যোগী যোগ চিন্তে মন....(রাধাবিরহ)

বিবাহরীতিঃ যে যুগের সমাজে পরকীয়া প্রেম প্রচলন ছিল, এর পাশাপাশি আত্মীয়সম্পর্কে বিবাহরীতির কথাও পাওয়া যায়। তাই কৃষ্ণ সম্পর্কে মামী রাধার প্রতি আসক্ত।

লোকাচার ঃ সমকালীন বঙ্গসমাজে লোকনিন্দা, সামাজিক আচরণ বিধি যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি সামাজিক কোন্দল ও একঘরে করে দেবার রীতিও প্রচলন ছিল। তাই আইহন মাতাকে প্রতিবেশীরা সাবধান করে বলেছিল–

''আপন আপন বহু হাটক পাঠায়িব।
তেক্ষার ঘরত অন্ন পানি না খাইব।''

সংস্কার ঃ মধ্যযুগীয় রীতিনীতি ও সংস্কারে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে হাঁটি, টিকটিকির ডাক, কাকের ডাক, শকুন দর্শনের মত অমঙ্গলজনক চিহ্ন প্রচলিত ছিল। আবার অন্যদিকে ভাদ্রমাসের চতুর্থীতে চন্দ্রদশন জলের দাগকাটা, গরুর আসনে বসা, শূন্য কলসি দর্শনও অশুভের ইঙ্গিত বহন করে। কাব্যে আছে–

''ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী
জল মাঝেঁ দেখলোঁ মো কী নিশাপতি।''

শুধু তাই নয়, সেই যুগের বঙ্গনারী বিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। তারা মনে করত–

'পূন্য কইলেঁ স্বগ্গে যাইত্র
নানা উপভোগ পাইত্র
পাপেঁ হও নরকের ফল।'

এছাড়াও পিন্ডদান, প্রায়শ্চিত্ত, পাপস্খলন ও গঙ্গাস্নানের প্রসঙ্গ এই কাব্যে আছে।

খাদ্যপ্রণালী ঃ 'বংশীখন্ড' শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার পাগলিনী দশাকালে ভোজনরসিক বাঙালি সমাজের রন্ধনশালার দৃশ্য পাই। যে যুগে বাঙালি সমাজে ভাত, শাক, নিমঝোল, পটলভাজার পাশাপাশি অম্বুল সহযোগে পানের প্রচলনও ছিল।

নারীর সাজসজ্জা ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নারীদের সাজসজ্জার উপকরণ হিসাবে হার, কুন্তল, বালা, কিঙ্কিনির উল্লেখ আছে। এছাড়াও প্রসাধনী সামগ্রী হিসাবে চন্দন, কাজল, ফুলের প্রচলন সেযুগের বাঙালি সমাজকেই মনে করিয়ে দেয়।

শাসন ব্যবস্থা ঃ রাজতান্ত্রিক শাসনের কথাও একাব্যে স্পষ্ট–তাই রাধা কৃষ্ণকে কংসের ভয় দেখান, যিনি ছিলেন তৎকালীন দন্ডমুন্ডের কর্তা।

ব্যবহার্য সামগ্রী ঃ এছাড়াও ব্যবহার্য-সামগ্রী হিসাবে হাঁড়ি, ঘটি, কেড়ুয়া, এবং অস্ত্র হিসাবে লাঠি, সড়কি, কামান, বান, শব, ত্রিশূলের প্রচলনের কথাও এই কাব্যে বড়ু চন্ডীদাস দিয়েছেন।

ধর্মসাধনা ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে বাংলা সমাজে ধর্মের তেমন পরিচয় না থাগেও বাসুলি বা চন্ডীদেবীর পূজার প্রচলনের কথা পাওয়া যায়। এইভাবে বড়ুচন্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে সমকালীন সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। তাই কাব্যটি আদি মধ্যযুগের গ্রামবাংলার জীবন কথারূপে জীবন দলিল তা বলা যায়।

প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের অনুবাদ চর্চার ধারায় যা অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় কৃত্তিবাস ওঝার কবি কৃতিত্ব আলোচনা করো। ৫

Pearl coaching center

BENGALI HONOURS

উঃ মধ্যযুগে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল 'রামায়ণ'। কিন্তু কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় আদি কবি না হলেও অনুবাদকের মধ্যে তিনি ছিলেন আদি। রামায়ণের নিজস্ব গুরুত্ব এবং বাঙালি সম্ভবত সর্বাগ্রে রামায়ণের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল। বাঙালির মানস জাগরণের ঊষা লগ্নে রামায়ণ অনুবাদক মহাকবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব ঘটেছিল।

রামায়নের রূপান্তর 'পাঁচালী' ঃ আমরা সাধারণভাবে মনে করে থাকি যে কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকিকৃত রামায়ণকে বাংলা মহাকাব্যে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস স্বয়ং গ্রন্থকে 'মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেন নি। একে তিনি 'রামায়ণ পাঁচালী' নামেই উল্লেখ করেছেন। রামায়ণের কাহিনি নিয়ে আপন ভাবরসে জারিত করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়।

মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য ঃ কৃত্তিবাস মহাকবি ছিলেন। তিনি অনুবাদক মাত্র নন। বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি অনুসরণ করেছেন, রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। প্রয়োজন মত তিনি গ্রহণ-সংযোজন ও সংস্কার করে অতি প্রাচীনকালের আধারামায়নক তিনি সমসাময়িক কালের উপযোগী করে বাংলা রামায়ণে পরিণত করেছেন। কাহিনী পরিকল্পনাতেও তিনি একান্তভাবে বাল্মীকিকে অনুসরণ করেননি। তিনি জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ণ এবং ভারতীয় পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন। রামায়ণের গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি, রাম লক্ষণাদির চরিত্র, পিতৃভক্তি, পত্নী প্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলে বাঙালিকে আত্মজাগরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়নে বাংলা তথা বাঙালির আচার-অনুষ্ঠান, স্ত্রী লোকাচার, উল্লিখিত হয়েছে, বাঙালির রসনাতৃপ্ত করা খাদ্য তালিকার সঙ্গে বাঙরার ফুল, ফল, গন্ধ, প্রভৃতি বিষয় কবির কাব্যে উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ ভাগবতের অনুবাদক হিসাবে মালধর বসুর/গুনরাজ খাঁ-র কবিকৃতিত্ব আলোচনা করো। ১০

উঃ অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। রামায়ণ মহাভারতের মত মধ্যযুগে একাধিক পুরাণের অনুবাদ হয়েছিল। এটি শ্রীমৎভাগবদ পুরান। তথা এই ভাগবতে বারোটি খন্ডে সম্পূর্ণ। কবি মালাধর বসু তিনশো বত্রিশটি অধ্যায় ও আঠারো হাজার শ্লোক সংকলিত ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধে সরল বাংলায় অনুবাদ করেন। বৈষ্ণব মতের শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের সূচনা করেন বর্ধমানের কুলীন গ্রামবাসী কবি মালাধর বসু।

মালধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃষ্ণলীলার প্রথম কাব্য। এই গ্রন্থের অন্য নাম-'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল'. এই গ্রন্থের দুই ছত্র থেকে জানা যায়।

''তেরশ পঁচানয় শকে গ্রন্থ আরম্ভন
চতুর্দশ দুই শকে হইল স মাপন।''

অর্থাৎ গ্রন্থটি কবি ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন এবং গৌড়েশ্বরের আনুকূল্যে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ সমাপন করেন। সেই গৌড়েশ্বরই তাঁকে 'গুনরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন বলে জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের বিজয় কাব্যের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের গৌরব কাহিনী বা সভাযাত্রা বা মঙ্গলকথা। দশম ও একাদশ স্কন্ধ নিয়ে গঠিত তাঁর কাব্যের তিনটি ধারা—(১) বৃন্দাবনলীলা (২)মথুরালীলা (৩) দ্বারকালীলা। বৃন্দাবনলীলায় রয়েছে, ভূভার হরণের জন্য বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপে আবির্ভাব থেকে মথুরা যাত্রা, অন্যদিকে মথুরালীলায় রয়েছে কংসের নিধন থেকে দ্বারকায় জলদূর্গ নিমার্ণের উদ্যোগ এবং দ্বারকালীলায় রয়েছে দ্বারকাপুরী নির্মাণ থেকে কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনা। এই কাহিনীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও এরই মাঝে লোক প্রচলিত কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছেন তাই মালাধর বসু মূল ভাগবতের হুবহু অনুবাদ করেননি, করেছেন মর্মানুবাদ। এখানেই তাঁর কাব্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদক হিসাবে মালাধর বসুর কৃতিত্ব ঃ মালধর বসু মূলত ভক্ত। দ্বিতীয়ত কবি। তাই কৃষ্ণের মাধুর্য লীলার কথা বললেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপকে তাঁর অনুবাদ বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন তিনি বিচক্ষণ ছিলেন বলেই কাহিনীর দিকে গুরুত্ব দিয়ে তত্ত্বাংশ অনেকটা খন্ডিত করেছেন জনসাধারণের জন্য। ফলে সহজেই কাব্যটি বোধগম্য উঠেছে।

''লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালি রচিয়া''

এছাড়াও অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

Pearl coaching center

BENGALI HONOURS

১) ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছেন কবি। পাশাপাশি ভাগবত বহির্ভূত বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনী অবলম্বনে বৃন্দাবন লীলা, রাসলীলা, দানলীলা ও নৌকালীলা গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রণয়লীলাও তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

২) তাঁর কাব্যে কবিত্বময় বর্ণনা এবং শিল্পচাতুর্যের প্রকাশ দুর্লক্ষ্য,কিন্তু সহজ, সরল, নিরঙ্কৃত ভাষায় কৃষ্ণের ঐশীশক্তির বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য পরিকল্পনা।

৩) মালধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে যে ভক্তি লক্ষ্য করা যায়, তা হল শাস্ত্রীয় ভক্তি। যেমন অর্জুনকে প্রদত্ত ব্যাসদেবের উক্তি 'সর্বভূতসমহরিসর্বধর্ম্ময়' অর্থাৎ প্রাক্‌চৈতন্যযুগের সাধারণ ভক্তির আদর্শ তাঁর কাব্যে উপস্থিত হয়েছে।

৪) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বাঙালির জীবন প্রকৃতির গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তাঁর কাব্যটি বাঙালির এত প্রিয়। বাঙালার রীতিনীতি, পারিবারিক ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁর কাব্যে সুন্দর করে চিত্রিত।

৫) কাব্যটিতে 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মম প্রাণনাথ'- বাক্যে 'প্রাণনাথ' শব্দটি সর্বপ্রথম তিনিই ব্যবহার করেন এবং পরবর্তীতে বৈষ্ণব ভক্তদের রাগানুরাগ, সাধকের আভাস তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়।

৬) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বাঙালির তৎকালীন দেশ-কালের ছায়াপাত ও ঘটেছে। কারণ সেদিনের যুগবাসনাই ছিল প্রবল তাই। কাব্য সম্পাপ্তি অংশে কবি যুগধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

''ম্লেচ্ছজাতি রাজা হব অধর্ম পালিব।
যার ধন দেখিব, তার সব হরি লব।।''

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পাঠান শাসনকালের বিশৃঙ্খলাকে নিদর্শন করতে চেয়েছেন কবি।

পরিশেষে বলা যায়, বিষয়বস্তু হিসেবে শ্রীকৃষ্ণবিজয় তেমন কাব্য গুণান্বিত না হলেও বাংলা বৈষ্ণব ঐতিহ্যের এটি প্রথম গ্রন্থ— তা স্বীকার করতে হবে। ভাগবতকে পয়ার ছন্দে বেঁধে ও পাঁচালী রচনা করে তৎকালীন সময়ের প্রায় নিরক্ষর বাঙালি সমাজের কাছে ভাগবতের অভাব পুরন করেছিলেন। অন্যদিকে অনুবাদক হিসেবে বাঙলা ও বাঙালি জাতির কাছে আজও ভক্তকবি হিসেবে মালাধর বসু স্মরণীয়তার দাবি রাখেন।

প্রশ্ন ঃ গোবিন্দদাস কোন পর্যায়ের কবি, বৈষ্ণব পদাবলীতে তাঁর কবিপ্রতিভা আলোচনা কর। ১০

উঃ অভিসার পর্যায়ের গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ কবি। পাশাপাশি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনাতেও তিনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে' রূপ গোস্বামী অভিসারিকার প্রসঙ্গে বলেছেন–'যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাঘিসরত্যকি' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংকেত কুঞ্জে নায়ক ও নায়িকার মিলনের জন্য যে যাত্রা তাই হল অভিসার। বৈষ্ণব পদাবলীতে 'অভিসার' একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

''প্রিয়ের মিলন আসে কুঞ্জেতে গমন।
সংকেত পূর্বক অভিসারের লক্ষণ।''

গোবিন্দদাস কবিরাজ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমনি এক অনন্য সচেতন শিল্পী, যাঁর আশ্চর্য কলমে ফুটে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলীর নানা ভাষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সুপরিপক্ক জ্ঞান এবং গভীর ভক্তির মার্জিত দ্যুতিতে তাঁর পদাবলীর মধ্যে একধরনের মন্ডনকলা নৈপুন্যে, অপূর্ব ছন্দ নির্মাণে এবং শব্দ ব্যবহারের সুমিত কুশলতায় গোবিন্দ দাস অন্যান্য কবিদের অতিক্রম করে গেছেন। শুধু বাংলা ভাষায় নয় বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর ব্রজবুলি পদ আজও অবিসংবাদী বা অমলিন। শ্রী গৌরাঙ্গকে তিনি স্বচক্ষে না দেখলেও নিজের কবি হৃদয়ের কল্পনা ও ভক্তহৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যময় শ্রী গৌরাঙ্গের ভাবতন্ময় দিব্যমূর্তি অঙ্কন করেছেন। তেমনই একটি উল্লেখযোগ্য পদ হল–

''নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।